উপস্থিত

বিচারপতি জনাব এম, ইনায়েতুর রহিম
এবং
বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

ফৌজদারী আপীল নং ৪৮৯২/২০০৫

মোঃ জিয়াউর রহমান ওরফে জিয়া এবং অন্য

----------আপীলকারীগণ।

বনাম

রাষ্ট্র ---অপরপক্ষ।

জনাব ফজলুল হক খান ফরিদ, এ্যাডভোকেট

---আপীলকারীদ্বয়ের পক্ষে

জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন সরদার,

ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল

জনাব গাজী মোঃ মামুনুর রশিদ,

সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

--- অপরপক্ষে

শুনানী ঃ জানুয়ারী ৩ ও ৪, ২০১২ ইং

রায় প্রদানঃ জানুয়ারী ৮, ২০১২ ইং

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

দন্ডিত আপীলকারীদ্বয় অতিরিক্ত দায়রা জজ, আদালত নং ২, টাঙ্গাইল কর্তৃক দায়রা মামলা নং ৪৭/২০০৩, যাহার জি, আর, নং ২০২(২)২০০২, যাহা পোপালপুর থানার মামলা নং ১৬(৫) ২০০৫, ধারা ৩০২/৩৪ হইতে

উদ্ভুত তাহাতে দোষী সাব্যস্তক্রমে যাবজ্জীবন কারাদন্ড সহ প্রত্যেককে ১০,০০০/- জরিমানা অনাদায়ে আরো ১ (এক) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইয়া দন্ডিত-আপীলকারীদ্বয় অত্র আপীল দায়ের করিয়াছেন।

রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, এজাহারকারী ১নং সাক্ষী মোঃ মতিয়ার রহমান গত ইং ৩০/০৫/২০০২ং তাং ১৭-০৫ মিনিটের সময় গোপালপুর থানায় এক লিখিত এজাহার দাখিল করিয়া জানান যে, অদ্য দুপুর অনুমান ১৩ঃ২৪ মিঃ সময় তাহার ছোট ছেলে মোঃ শাহীনুর উত্তর গোপালপুর সাকিনের নিজ বাসার সাথে সংযুক্ত মুদী দোকানে বসিয়া বেচা কেনা করিতেছিল। এমন সময় আসামী জিয়াউর রহমান জিয়া উক্ত দোকানে বাকীতে পান ক্রয় করিতে চায়। এজাহারকারীর ছেলে বাকীতে পান বিক্রি করিতে অস্বীকার করায় আসামী জিয়া তাহাকে গালাগালি শুর করে এবং তাহাকে মারিতে উদ্যত হয়। এজাহারকারীর বড় ছেলে মনিরুজ্জামান ও তার স্ত্রী আগাইয়া আসিলে এজাহারভুক্ত আসামীগণ একত্রে আসিয়া আসামী জিয়ার হাতে থাকা কাঠের (ডুম) লাকড়ী দিয়ে মনিরুজ্জামানকে ঘাড়ে পিঠে ও কোমরে আঘাত করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়। আসামী কোহিনুর তাহার হাতে থাকা অপর একটি কাঠের ডুম (লাকড়ী) দিয়ে এজাহারকারীর স্ত্রীকে মারপিট করিয়া জখম করে। ডাক চিৎকারে আশে পাশের লোকজন আসিতে থাকিলে আসামীগণ চলিয়া যায়। জখমীদের গোপালপুর হাসপাতালে নিলে জখমী

মনিরুজ্জামানের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাহাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায়। অতঃপর উক্ত এজাহারের ভিত্তিতে গোপালপুর থানায় দন্ডবিধির ৩২৩/৩২৫/৩০২/৩৪ ধারায় মামলা নং-১৬ তারিখ ৩০/০৫/২০০২ রুজু হয়।

অতঃপর তদন্তকারী কর্মকর্তা যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে এজাহারভূক্ত আসামী (১) জিয়াউর রহমান ওরফে জিয়া এবং (২) মোছাঃ কহিনুর বেগমের বিরুদ্ধে ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা পাইয়া দন্ডবিধির ৩২৩/৩০২ ধারায় অভিযোগ পত্র নং-৬৯, তাং-০৫/১০/২০০২ দাখিল করেন। এজাহারভূক্ত ৪নং আসামী মাখন এর বিরুদ্ধে অত্র মামলার অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় তাহাকে অত্র মামলার দায় হইতে অব্যাহতির সুপারিশ করেন। উল্লেখ্য যে, এজাহারভূক্ত ৩নং আসামী ইতিমধ্যে জেল হাজতে মৃত্যুবরণ করায় তাহার নামও বাদ দেওয়া হয়।

অতঃপর মামলাটি বিচার নিষ্পত্তির জন্য টাংগাইল দায়রা জজ আদালতে আসিলে দায়রা মামলা নং-৪৭/২০০৩ হিসাবে নিবন্ধিত হয় এবং দন্ডিত-আপীলকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করিয়া তাহা পাঠ করিয়া শুনাইলে তাহারা নিজেদের নির্দোষ দাবী করেন। তৎপর মামলাটি বিচারের জন্য অতিরিক্ত দায়রা জজ ২য় আদালত, টাংগাইল বদলী হয়। রাষ্ট্রপক্ষ মামলাটি প্রমাণের জন্য ১৩ জন সাক্ষীকে আদালতে পরীক্ষা করেন এবং দন্ডিত-আপীলকারী পক্ষে তাহাদের জেরা করা হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের ১ নং সাক্ষী মোঃ মতিয়ার রহমান জবানবন্দিকালে বলেন যে, এই মামলায় তিনি এজাহারকারী,আসামী চারজন। উত্তর গোপালপুর তাহার বসতবাড়ীর সামনের বারান্দায় তাহার মুদির দোকান। গত ৩০-৫-২০০২ ইং সনে দুপুর ১.১৫ এর সময়ে তাহার ছোট ছেলে শাহীনুর উক্ত মুদির দোকানে বসিয়া বেচাকেনা করিতেছিল। তখন আসামী জিয়াউর রহমান জিয়া বাকীতে পান নিতে চায়। তাহার ছেলে বাকীতে পান না দেয়ায় জিয়া তাহার ছেলেকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। পরে তাহার দোকানের পশ্চিমে নূরী বেকারীর সামনে লাকড়ির স্তুপ হইতে লাকড়ী নিয়ে তাহার ছেলেকে মারতে আসে। তখন শাহীনুর ডাক চিৎকার করিলে ডাক চিৎকার শুনিয়া তিনি, তাহার বড় ছেলে মনিরুজজামান, তাহার স্ত্রী মনোয়ারা বেগম দৌড়িয়ে বাহির হইয়া আসে এবং দেখেন জিয়াউর রহমান তাহার ছেলেকে মারার জন্য চড়াও হইয়াছে। তখন তিনি জিয়াকে বারণ করিতে থাকে ও কি হইয়াছে তা জিজ্ঞাসা করে। এমন অবস্থায় কহিনুর, মাখন, আজাহার দৌড়াইয়া আসেন। দৌড়াইয়া আসিয়া কাঠের লাকড়ী দিয়ে তাহাকে, তাহার স্ত্রী ও ছেলেকে মারধর শুরু করেন। তাহারা ভয়ে ডাক চিৎকার শুরু করে। লোকজন চিৎকারে বাহির হইয়া আসেন। এরই এক পর্যায়ে তাহার বড় ছেলে মনিরুজ্জামানকে জিয়ার হাতে থাকা কাঠের লাকড়ি (ডুম) দিয়া সজোরে ঘাড়ে আঘাত করে। ফলে ছেলের ঘাড়ে থেতলানো জখম হয়। ঐ আঘাতে তাহার ছেলে মনিুরুজ্জামান মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া যায়। মাটিতে পড়িয়া গেলে কহিনুর, আজাহার ও মাখন তাহার

ছেলের উপরে মারপিট শুর করেন। পিঠে কোমড়ে ও বাম হাতে একাধিক জখম হইয়াছিল। তাহার স্ত্রী মনোয়ারা বেগম তাহার ছেলেকে বাঁচাতে গেলে আসামী কহিনুর তাহার হাতে থাকা কাঠের খন্ড (চলা) দিয়া তাহার স্ত্রীর মুখের উপরে বাড়ি মারে। উক্ত বাড়িতে নাক ফুল ভাঙ্গিয়া মাংসের মধ্যে ঢুকিয়া যায়। তাহার ছেলেকে রক্ষা করিতে গেলে সাক্ষী আবদুল আজিজকে মারপিট করিয়াছে আসামীরা। পরে ছেলে ও স্ত্রীকে গোপালপুর থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে লইয়া যায়। সেখানে তাহার স্ত্রীর চিকিৎসা করে। তাহার ছেলের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ময়মনসিংহ মেডিকেল হাসপাতালে এ্যাম্বুলেন্সে নেওয়ার কালে মধুপুর থানার জলছত্র নামক স্থানে তাহার ছেলে মারা যায়। পরে ছেলের লাশ তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আনেন। কিছুক্ষণ পরে ছেলের লাশ ভ্যান যোগে গোপালপুর থানায় নিয়ে যান এবং এজাহার দায়ের করেন। এজাহার ও তাহার সই প্রদশর্নী-১,১(ক) হিসাবে সনাক্ত করেন। ৫-৩০মিঃ এ থানায় ভ্যানের উপরে ছেলের লাশ এর সুরতহাল তৈরি করে এবং তাহার সই নেয়। সুরতহাল ও তাহার সই যাহা প্রদশর্নী-২, ২(ক)হিসাবে চিহ্নিত হয়। ঐ দিনেই ৬ঃ৪৫ মিনিটে তাহার দোকানের সামনে কাঠের ডুম যাহা দিয়া ছেলে ও স্ত্রীকে মারে তাহা দারোগা জব্দ করেন। জব্দনামা ও উহাতে তাহার দস্তখত প্রদশর্নী-৩, ৩(ক) হিসাবে চিহ্নিত হয়। সকল আলামত বস্তু প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত হয়।

জেরায় তিনি বলেন যে, কাঠের ডুম যাহা এক থেকে দেড় হাত লম্বা। যাহা দুই হাতে ধরিতে হয়। আসামী আজাহার ধৃত হয় এবং হাজতে থাকাকালে মারা যায়। ভুলবশতঃ ১ঃ৩০ টায় হাসপাতালের কথাটি বলেন। ৫ঃ৩০ জব্দ নামার কথা সংশোধন করে বলেন। সাক্ষী মোহাম্মদ আলী, ভাই, মনোয়ারা বেগম স্ত্রী, শাহীনুর রহমান তাহার ছেলে। তাহার বাড়ী হইতে ১০ হাত দূরে মুদীর দোকান। বাড়ির ভিতর হইতে রাস্তা-দোকান দেখা যায়। বাড়ির সামনে পাকা রাস্তা। গাড়ি ও লোকজন সব সময় যাতায়াত করে। আঃ হাই পশ্চিমে, আলিম হোসেন তাহার দোকানের পূর্বে, সোহরাব চেয়ারম্যান তাহার দোকানের পশ্চিমে, মাসুম পশ্চিমে, সোরহাব ও সোবা তাহার বাসার পূর্বে, দোলন বাসার পূর্বে, কাজী সামুল এবং খায়রুল তাহার বাসায় দক্ষিনে, শামীম বাসার পশ্চিমে। আসামী জিয়াউর রহমানের মা কহিনুর বেগম। আজাহার জিয়াউর রহমানের পিতা, জেলখানায় মারা গিয়াছেন। আসামী মাখন তাহার চাচাত ভাইয়ের ছেলে। তাহার দোকান টিনের দরজা,ঝাপ টিনের ও কাঠের ফালক দ্বারা আটকানো। ঝাপের দরজা ৪/৪ ১/২ হাত লম্বা ২ টা বাঁশের খুটি দ্বারা আটকাইয়া খুলিয়া রাখিতে হয়। লোকজন আসিয়া ঝাপের নিচে দাঁড়ায়। বাঁশের খুটি কোন দিন ছোটে নাই। তবে কোন কারণে ছুটিয়া গেলে টিনের ঝাপড়িতে পাড়ে। তাহার দোকানের পশ্চিমে একটি বেকারীর ফ্যাক্টরী আছে। দোকানের মালিক আব্দুল হাই। ঐ দোকানে ১০/১৫ জন কর্মচারী থাকে। ঐদিন দোকান বন্ধ ছিল। প্রতি বৃহস্পতিবার বেকারী দোকান বন্ধ থাকে। ঐ দোকানে লাকড়ী ব্যবহৃত হয়। ২

হাত/১ হাত বিভিন্ন রকমের ও সাইজের লাকড়ি ব্যবহৃত হয়। তিনি দারোগার কাছে লাকড়ি দিয়াছেন। তাহা ১ হাত লম্বা, দুই হাত দিয়া ধরা যায় আবার একহাত দিয়া ধরা যায়। শাহীনুর এবং জিয়াউর রহমানের ঝগড়ার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না। ডাক চিৎকারের ১/২ মিনিট পরেই তিনি ঘটনাস্থলে যান। তাহার স্ত্রী তাহার পিছে পিছে যায়। তাহারা যাইয়া ঐ ২ জনকে দেখিতে পান। তিনি ঘটনাস্থলে আধা ঘন্টা পর্যন্ত ছিলেন। তিনি ও স্ত্রী পৌছার ২/১ মিঃ পরে তাহাদের ডাক চিৎকার শুনিয়া ২০/১৫ জন লোক আসে। সর্ব প্রথম আব্দুল আজিজ আসে। তারপরে আজিজ, বেলাল,সালাম, আব্দুল্লা আসে। সর্ব শেষে কে আসে লক্ষ্য করেন নাই। তাহার সামনেই আসামী জিয়াউর তাহার ছেলেকে আঘাত করে। তাহার ছোট ভাই মোহাম্মদ আলী ঘটনার সময় আসে। তাহারা একই বাড়ীতে থাকে। তাহার ছেলেকে আঘাত করার পরে তাহার স্ত্রীকে আঘাত করে। তাহার স্ত্রী ধরিতে গেলে তাৎক্ষনিক তাহার স্ত্রীকে আঘাত করে। দোকানে রক্ত পড়ে নাই। তাহার স্ত্রী শাড়ী কাপড়ে রক্ত পড়ে। তাহার স্ত্রীর রক্তমাখা শাড়ি কাপড় দারোগা সাহেব নেয় নাই। তাহার স্ত্রীকে হাসপাতালে নেন আবার ঐ দিন লইয়া আসেন। ০২ঃ০৫ মিঃ অনুমান স্ত্রীকে হাসপাতালে নেন এবং ২৫/২০ মিঃ পরে ছাড়াইয়া আনেন। ঐ সময়ে তাহার ছেলেকেও হাসপাতালে নেন আবার একই সময় ছাড়াইয়া নেন। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে রেফার করিলে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে জলছত্র নামক স্থানে মারা যায়। গোপালপুর হাসপাতাল হইতে জলছত্র ১৫ কিঃমিঃ অনুমান দূরে

হইবে। এ্যাম্বুলেন্সে তিনি, স্ত্রী ও শাহজাহান ছিল। অনুমান ৩ টা ৩ঃ১৫ মিঃ সময়ে তাহার ছেলে মারা যায়। সেখান হইতে লাশ সোজা তাহার বাসায় আনেন। অনুমান ৪টার দিকে বাসায় পৌঁছান। তাহার মৃত চাচা বুজরত আলীকে আসামী কহিনুর বেগম ধর্ম ভাই বানায়। উক্ত বুজরত আলী ২ দিন আগে মঙ্গলবার মারা যায়। বুজরত আলীর বাড়ী তাহার গ্রামের বাড়ির পাশেই। বুজরত আলী মারা গেলে কহিনুর ও আত্মীয়-স্বজন তাহার বাড়ীতে যায়। আজাহার গিয়াছিল। ইহা সত্য নহে যে, কথিত মতে কোন ঘটনা নাই। ইহা সত্য নহে যে, আসামী জিয়া তাহার ছেলেকে আঘাত করে নাই। ইহা সত্য নহে যে, মাথা ছাড়া শরীরের অন্য কোথাও আঘাত করার উক্তি মিথ্যা। ইহা সত্য নহে যে, আসামী কহিনুর তাহার স্ত্রীকে কোন আঘাত করে নাই। ইহা সত্য নহে যে, বুজরত আলীর সম্পত্তির লোভে আসামী কহিনুর ও তাহার ছেলেকে আসামী করিয়া মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছেন। ইহা সত্য নহে যে, তিনি জবানবন্দীতে অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। তিনি একটি লিখিত এজাহার দিয়েছিলেন। তাহার কথামত দারোগা .সাহেব লেখিয়া তাহাকে পড়িয়া শুনাইলে তিনি শুদ্ধ স্বীকারে স্বাক্ষর করেন। এই এজাহার থানার ক্লার্ক শফিউদ্দিন লেখেন। ইহা সত্য নহে যে, এজাহার তাহার কথামত লেখা হয় নাই। ইহা সত্য নহে যে, তাহার লেখা এজাহারে আসামীদের নাম ছিল না। ইহা সত্য নহে যে, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ২ নং সাক্ষী আব্দুল আজিজ বলেন যে, মৃত মনিরুজ্জামানের লাশের সুরতহাল করার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। গত ইং ৩০-০৫-২০০২ ইং তারিখে বিকেল ৫-৩০ মিনিটে সুরতহাল করিয়া প্রতিবেদন তৈরি করিলে তাহাকে পড়িয়া শুনাইলে তিনি ৩ নং ক্রমিকে সহি করিয়াছেন। সুরতহাল প্রতিবেদনে তাহার স্বাক্ষর প্রদশর্নী ২/খ হিসাবে সনাক্ত করেন। পুলিশ তাহার সামনে ২ টা কাঠের খন্ড ঐ দিনই মতিয়ারের দোকানের সামনে হইতে জব্দ করিয়া জব্দ তালিকায় তাহার স্বাক্ষর নেয় যাহা প্রদর্শনী ৩/খ হিসাবে সনাক্ত করেন। গত ইং ৩০/০৫/২০০২ তারিখে ১ঃ১৫ মিনিট সময়ে ঘটনা ঘটে। উত্তর গোপালপুর ঐ দোকানের কাছে তিনি রাইস মিলের ড্রাইভারী করেন। তিনি ভাত খাইতেছিলেন তখন ডাক চিৎকার শুনিতে পান। তিনি দৌড়াইয়া আসিয়া দেখেন যে, আসামী জিয়া (ডকে সনাক্ত) একটি কাঠের টুকরা দ্বারা (মৃত) মুনিরের ঘাড়ের মধ্যে বাড়ি মারে। আসামী শাহীনকেও (মুনিরুজজামানের ছোট ভাই) বাড়ি মারিতে উদ্যত হয়। তিনি তখন ঠেকানোর চেষ্টা করিলে তাহার বুকে আঘাত লাগে। দারোগা তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন।

জেরাকালে তিনি বলেন যে, দারোগা ঐ দিনই তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছে। ইহা সত্য নহে যে, তিনি দারোগার কাছে ঘাড়ে আঘাতের কথা বলেন নাই। মতিয়ারের দোকান হইতে থানা ১/২ মাইল দূরে। লাশ আনিলে খবর পাইয়া থানাতে গিয়েছিলেন। তিনি অনুমান ৫ঃ৩০মিনিটের একটু আগে

মুনিরুজ্জমানের মৃত্যু সংবাদ পান। মতিয়ারের দোকান ও তাহার ধান ভাঙ্গার মেশিন পাশাপাশি, ঘরের ভিতরে থাকিলে মতিয়ারের দোকান দেখা যায় না। তিনি ডাক চিৎকার শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যান। তিনি মেশিন ঘরের ভিতর হইতে ডাক চিৎকার শুনিতে পান। ৪/৫ জন ধান ভাঙ্গানোর লোক ছিল নাম মনে নাই। ডাক চিৎকারের আগে তিনি কিছু দেখেন নাই। তিনি ঘটনাস্থলে কতক্ষণ ছিলেন মনে নাই। তিনি রক্ত পড়িতে দেখেন নাই। মনিরুজ্জামানকে হাসপাতাল বা থানাতে কে লইয়া যায় তিনি বলিতে পারেন না, বাদী ও বিবাদীরা ছাড়া ঘটনাস্থলে কে কে ছিল মনে নাই। ইহা সত্য নহে যে, কথিত মতে কোন ঘটনা ঘটে নাই। ইহা সত্য নহে যে, বাদীর কথা মত তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৩ নং সাক্ষী মোঃ শাহজাহান তার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি ইউ,পি সদস্য। গত ইং ৩০/০৫/২০০২ সময় অনুমান ১-১৫ মিঃ ঘটনা। আসামী (১) জিয়াউর রহমান জিয়া,(২)আজহার উদ্দিন ড্রাইভার, (৩) কহিনুর এদের মধ্যে আজাহার মারা গিয়াছে। বাকী ২ জন ডকে দাঁড়ানো আছে। পুলিশ সুরতহাল করিলে প্রতিবেদনে তিনি স্বাক্ষর দেন। ইং ৩০/০৫/২০০২ তারিখে সময় বিকেল ৫-৩০ মিঃ থানাতে সুরতহাল প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করেন। ২নং এক্সিকে তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী ২/গ হিসাবে সনাক্ত করেন। ঐ দিন পুলিশ তাহার সামনে ২টা কাঠের টুকরা জব্দ করিয়া তালিকায় তাহার স্বাক্ষর নেন।

জব্দ তালিকায় তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী ৩/গ হিসাবে সনাক্ত করেন। পুলিশ তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন।

জেরায় তিনি বলেন যে, কাঠের টুকরা অনুমান এক হাত লম্বা বেশ মোটা। হাত দিয়া ধরিয়া আঘাত করা যায়। টুকরাতে রক্ত ছিল কি না মনে নাই। তিনি মনিরুজ্জামানের লাশের সংগে থানাতে যান। অনুমান বিকেল ০৫-০০ টার সময় থানাতে লাশ নেওয়া হয়। তিনি, আবদুল আজিজ, মোহাম্মদ ও আরও অনেকে ছিল। ইহা সত্য নহে যে, এইগুলো সাজানো আলামত।

রাস্ট্র পক্ষের ৪ নং সাক্ষী মোহাম্মদ আলী তার সাক্ষ্যে বলেন যে, গত ইং ৩০/০৫/২০০২ বেলা অনুমান ১-১৫ মিঃ বাদীর মুদীর দোকানের সামনে ঘটনা। আসামী (১) জিয়াউর রহমান জিয়া, (২) আজাহার (৩)কহিনুর ইহাদের মধ্যে জিয়াউর ও কহিনুর ডকে দাঁড়ানো আছে। মৃত মনিরুজ্জামানের লাশের সুরতহাল করিলে গোপালপুর থানাতে তিনি সুরতহাল প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করেন। তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী ২/ঘ হিসাবে সনাক্ত করেন।

জেরায় তিনি বলেন যে, বিকেল অনুমান ০৫ঃ০০টার দিকে তিনি,বাদীও শাহজাহান থানাতে যান। ভ্যানে লাশ লইয়া যান। তিনি মতিয়ারের দোকানের সামনে বা ভ্যানে রক্ত দেখেন নাই।

রাস্ট্র পক্ষের ৫নং সাক্ষী ডাঃ মোঃ হাফিজুর রহমান তার সাক্ষ্যে বলেন যে, গত ইং ৩১/০৫/২০০২ তারিখ কং-১১১৯ মোঃ জুলহাস উদ্দিনের আনা ও

সনাক্ত মতে মৃত মনিরুজ্জামানের লাশের (২২) এর ময়না তদন্ত সম্পন্ন করেন। তিনি নিম্নলিখিত ইনজুরী সমূহ পানঃ-

(1) Blood from nose and mouth.

(II) Diffused selling measuring 1" X $\frac{1}{2}$" X 1" on mid part of the right neck.

(III) Multiple small abrasion found on posterior aspect of left elbow.

(IV) Abrassion measuring $\frac{1}{2}$" X $\frac{1}{2}$" lift mid back.

(V) Small abrasion on left lowing.

তিনি লাশের ব্যবচ্ছেদ পান-

on deep dissection done –Right sided neck muscle found congested and clot blood also found. Right sided carotid blood vessel found injured.

মতামত দিয়াছেন যে,

In my opinion death was due to haemorahage and shack as a result of injuries

mentioned above which was ante mortem and homicidal in nature.

ময়না তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী ৪, এবং তাঁহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী ৪/ক হিসাবে সনাক্ত করেন।

জেরায় তিনি বলেন যে, Age of injury নাই।লাশ থানা হইতে আনা হয়। ১নং কলামে রক্ত আসিয়াছে নাক মুখ দিয়া তাহা জখম ছাড়াও আসিতে পারে। মাথায় কোন জখম নাই। মাথার খুলি Healthy ছিল। মাজার হাড়কে Pelvis বলা হয়। Pelvis এর উপরে জখম ছিল কিন্ত Pelvis এ জখম ছিল না। ব্রেইন ষ্ট্রোক হইলে Carotid blood vessel injury হইতে পারে। ২নং আঘাত Blunt weapon দ্বারা হইতে পারে। ইহা সত্য নহে যে, ২নং জখমটা মোটা ভোতা অস্ত্রের দ্বারা হয় নাই। ইহা সত্য নহে যে, তিনি ময়না তদন্ত সঠিক ভাবে সম্পন্ন করেন নাই।

রাস্ট্র পক্ষের ৬ নং সাক্ষী মোছাঃ মনোয়ারা বেগম, তার সাক্ষ্যে বলেন যে, গত ইং ৩০/০৫/২০০২ তারিখে তাহাদের বাসার সামনে দুপুর ১ঃ১৫ মিঃ সময়ে তার ছেলে শাহীনুর দোকানে মুদীর দোকানদারী করিতেছিল। আসামী জিয়াউর রহমান বাকীতে পান চাহিলে দিতে অস্বীকার করিলে ছেলের সহিত তর্ক বিতর্ক হয়। তাহার হৈচৈ শুনিয়া তিনি, স্বামী মতিয়ার রহমান, ছেলে মনিরুজ্জামান ঘটনাস্থলে আসেন। তিনি মারামারি ছাড়ানোর চেষ্টা করেন। আসামী জিয়াউর রহমান একটা কাঠের টুকরা দিয়া তাদেরকে মারপিট করেন।

আসামী আজাহার কাঠের টুকরা দ্বারা তাহার স্বামীকে আঘাত করেন। আসামী কহিনুর বেগম কাঠের টুকরা দ্বারা তাহাকে মারে। আসামী জিয়াউর রহমান একটি কাঠের টুকরা দ্বারা তাহার ছেলে মনিরুজ্জামানের ঘাড়ে আঘাত করে, মাটিতে ছেলে পড়িয়া যায়।আসামী কহিনুর, আজাহার, মাখন এরা সকলে তাহাদের মারপিট করে। লোকজন আসিয়া তাহাদের রক্ষা করে। পরে তাহাকে ও ছেলেকে হাসপাতালে লইয়া যায়। তাহাকে ডাক্তার চিকিৎসা করেন। তার ছেলের অবস্থা আশংকাজনক দেখিয়া ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে রেফার করে। পথিমধ্যে তার ছেলে জলছত্র নামক স্থানে মারা যায়। লোকজন কহিনুর ও আজাহারকে ধরিয়া থানাতে দেয়। তিনি পুলিশের কাছে জবানবন্দি দিয়াছেন।

জেরায় তিনি বলেন যে, তিনি ঐ দিনই পুলিশের নিকটে বিকেলে জবানবন্দি দিয়াছেন। ইহা সত্য নহে যে, তিনি ও স্বামী দৌড়াইয়া গিয়াছেন এবং ছাড়ানোর চেস্টা করেন তাহা দারোগার কাছে বলেন নাই। ইহা সত্য নহে যে, আজকে আদালতে যাহা বলিলেন তাহার কোন কথাই তিনি দারোগার কাছে বলেন নাই। লোকজন আসামী কহিনুর ও আজাহারকে ঘরের ভিতরে ধরিয়াছিল। তাহার স্বামীও ছিল। তিনি যখন হৈ চৈ শুনেন তখন ঘরের ভিতরে ছিলেন। তাহার স্বামী ও বড় ছেলে ঘরের ভিতরে তখন ছিলেন। তিনি সংগে সংগে বাহিরে আসেন। তিনি আসিয়া কহিনুর,আজাহার, ছেলে মনিরুজ্জামানকে দেখেন। আরও লোকজনকে দেখিয়াছেন জিয়াকেও দেখিয়াছেন। সাক্ষী আজিজ, সালাম, বেলাল এদেরকে দেখিয়াছেন। আর কোনও লোক ছিল না। কতক্ষন

তর্কাতর্কি হয় বলিতে পারিবেন না। দোকানের ঝাপ উঠানো ছিল। বাঁশের খুঁটি দ্বারা আটকানো ছিল। তাহার ছেলেকে আগে মারিয়াছে পরে তাহাকে মারিয়াছে। সংগে সংগেই তাহাকে মারিয়াছে। তাহার ঘরের সংগে লাগানো দোকান ঘর। দোকানের সামনে রাস্তা। তাহার ছেলেকে অনুমান বিকাল ০৪-০০ টার সময় বাড়ীতে আনে। মধুপুর জলছত্র হইতে আসে। ভ্যানযোগে লাশ থানায় লইয়া যায়। গোপালপুর হাসপাতালে দুপুর ০২ঃ০০ টার সময় (অনুমান) যায়। জলছত্র হইতে বাসায় আসিলে তিনি আর কোথাও যান নাই। তাহার স্বামীও সংগে সংগেই ছিল। ইহা সত্য নহে যে, ঐ দিন ঐ সময় কোন ঘটনা ঘটে নাই। ইহা সত্য নহে যে, আসামী জিয়াউর রহমান তাহার ছেলেকে আঘাত করেন নাই। ইহা সত্য নহে যে, আসামী কহিনুর তাহাকে আঘাত করেন নাই। ইহা সত্য নহে যে, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন।

রাস্ট্র পক্ষের ৭ নং সাক্ষী শাহীনুর রহমান, তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, গত ইং ৩০/০৫/২০০২ তারিখ দুপুর ০১ঃ১৫ মিঃ সময়ে তাহাদের বাড়ী সংলংগ্ন মুদীর দোকানে বসিয়া বেচাকেনা করার সময় জিয়াউর রহমান জিয়া বাকীতে ২টা পান চায়। পান বাকিতে না দিলে খারাপ ভাষায় গালাগালি করে। আসামী দৌড়াইয়া পাশে লাকড়ীর দোকান হইতে একটি কাঠের ডুম আনিয়া মারপিট করিতে থাকিলে ডাক চিৎকারে বাবা, বড় ভাই মনিরুজ্জামান, মা ঘটনাস্হলে ছুটিয়া আসে। জিয়াকে বারণ করিলে শুনে না, কহিনুর, আজাহার ও মাখন ঘটনাস্থলে দৌড়াইয়া আসে। তাহারা আমাদের কাঠের ডুম দ্বারা মারপিট

করিতে থাকে। জিয়াউর রহমান আমাকে কাঠের ডুম দ্বারা মারে। ডাক চিৎকারে লোকজন আসে। আসামী জিয়াউর রহমান কাঠের ডুম দ্বারা তাহার ভাই মনিরুজ্জামানের ঘাড়ে বাড়ি মারিলে উপুড় হইয়া পড়িয়া যায়। কহিনুর, আজাহার ও মাখন এরাও কাঠের ডুম দ্বারা ভাই মনিরুজ্জামানকে বাড়ি মারে। তাহার মাকে কহিনুর কাঠের ডুম দ্বারা বাম দিকে বাড়ি মারে। জিয়া ও মাখন আবার তাহাকে মারিতে আসে। সাক্ষী আবদুল তাহাকে রক্ষা করে। তাহার মা ও ভাই মনিরুজ্জামানকে জখম অবস্থায় গোপালপুর হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। মাকে চিকিৎসা দেয়। ভাই মনিরুজ্জামানের অবস্থা দেখিয়া ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। পথিমধ্যে মধুপুর থানায় জলছত্র নামক স্থানে ভাই মনিরুজ্জামান মারা যায়। লাশ বাড়ীতে আনে। পরে লাশ থানায় লইয়া যায়। দারোগার কাছে জবানবন্দি দিয়াছেন।

আসামীপক্ষে জেরায় তিনি বলেন যে, কত তারিখে দারোগার কাছে সাক্ষী দিয়াছেন খেয়াল নাই। ইহা সত্য নহে যে, জিয়া তাহাকে মারার জন্য চড়াও হয় তাহা দারোগাকে বলেন নাই। কহিনুর, আজাহার, মাখন ও জিয়া তাহাকে মারপিট করে এই কথা দারোগাকে বলেন নাই। ইহা সত্য নহে যে, জিয়া তাহাকে আঘাত করে দারোগাকে বলেন নাই। ইহা সত্য নহে যে, জিয়া তাহার ভাই মনিরুজ্জামানকে আঘাত করিয়াছে দারোগাকে বলেন নাই। ইহা সত্য নহে যে, মাকে আসামী কহিনুর মারে দারোগাকে এই কথা বলেন নাই। ইহা সত্য নহে যে, তিনি দারোগার কাছে কোন জবানবন্দি দেন নাই। ইহা সত্য

নহে যে, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন। পান বিক্রির সময় তিনি একাই ছিলেন। তখন জিয়া একা পান লইতে আসে। বাকীতে পান লইয়া তর্কাতর্কি ৩/৪ মিনিট হয়। রাস্তার সামনে তর্কাতর্কি হয়। তখন কেহ আসে নাই। যখন লাঠি আনে তখন আসে। তাহার বাবা, মা ও বড় ভাই এক সংগে ঐখানে আসে। বাঁশের লাঠি দ্বারা দোকানোর ঝাপ আটকানো ছিল। বারান্দার একপাশ ঝাপ দিয়া দোকান করা হইয়াছে। বারান্দা ১৫ হাতX৪ হাত অনুমান লম্বা। পূর্বপাশে দোকান, পশ্চিম পাশে তিনি ছিলেন। মনিরুজ্জামান পশ্চিম পাশে বারান্দায় ছিল। তখনও কোন লোকজন আসেন নাই। ঘটনার পরেই অনুমান পৌনে দুইটার সময় মনিরুজ্জামানকে বাড়ীর ভিতরে লওয়া হয়। ভাইয়ের কোন রক্ত পড়ে নাই। মার নাক মুক দিয়া রক্ত পড়ে। ৪/৫ মিঃ ঘরের ভিতরে মনিরুজ্জামান ছিলেন। তিনিও গোপালপুর হাসপাতালে যান। ১০/১৫ জন লোক তাহাদের বাড়ীতে আসে। শাহজাহান, আজিজ, বেলাল, আবদুল্যাহ এরাও বাড়ীর ভিতরে আসেন। ঘটনার সময়ও এরা ছিলেন। আজিজ প্রথমে আসেন। সর্বশেষ কে আসে মনে নাই। ইহা সত্য নহে যে, ঐদিন ঐ সময় তাহাদের দোকানের সামনে কোন ঘটনা ঘটে নাই। ইহা সত্য নহে যে, আসামীরা ঐখানে কোন মারপিট করেন নাই। ইহা সত্য নহে যে, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন।

রাস্ট্র পক্ষের ৮ নং সাক্ষী আঃ সালাম, তার সাক্ষ্যে বলেন যে, গত ইং ৩০/০৫/২০০২ তারিখে দুপুর অনুমান ০১:১৫ মিঃ সময়ে উত্তর গোপালপুর বাদী মতিয়ার রহমানের দোকানের সামনে ঘটনা। আসামী (১) জিয়া, (২)

কোহিনুর, (৩) আজাহার ড্রাইভার এদের মধ্যে আসামী জিয়া ও কোহিনুর ডকে আছে। নিউ মদিনা ট্রেডার্স দোকানের তিনি কর্মচারী। তিনি হৈ চৈ শুনিয়া মতিয়ারের দোকানের সামনে আগাইয়া যান। দেখেন যে, আসামী জিয়া একটি কাঠের ডুম দিয়া লাঠির মতন মনিরুজ্জামানকে বাড়ি মারে। তখন মনিরুজ্জামানের মা আগাইয়া আসে। জিয়া তখন আবার মাকে বারি মারে। মনিরুজ্জামান ও তাহার মাকে গোপালপুর হাসপাতালে লইয়া যায়। মনিরুজ্জামানের অবস্থা আশংকাজনক দেখিয়া ময়মনসিংহ হাসপাতালে পাঠাইলে পথিমধ্যে মারা যায়। তিনি পুলিশের কাছে জবানবন্দি দিয়াছেন।

তিনি জেরায় বলেন যে, তিনি থানাতে জবানবন্দি দিয়াছেন। মাগরিবের পরে জবানবন্দি দিয়াছেন। এশার নামাজ ৮.০০ টায় হয়। হাকিম, বেলাল ও তিনি জবানবন্দি দেন। মৃত মনিরুজ্জামানের লাশ থানাতে ছিল কিনা মনে নাই। তাহার দোকান মনিরুজ্জামানের দোকানের বিপরীতে তাহা পুলিশকে বলেন নাই। তিনি নিউ ট্রেডার্স দোকানের কর্মচারী তাহা বলিয়াছেন কিনা খেয়াল নাই। ইহা সত্য নহে যে, জিয়া কাঠের ডুম দিয়া মনিরুজ্জামানকে আঘাত করে বলেন নাই। রাস্তা দিয়া লোকজন চলাচল করিতেছিল।তাহার দোকানে তখন অনেক কাষ্টমার ছিল। অনুমান ৪/৫ জন ছিল নাম জানেন না। তাহারা গিয়াছিল কিনা মনে নাই। বেলাল, আজিজসহ ৭/৮ জন লোককে তিনি ঘটনাস্থলে পান। হৈ চৈ আগে হয় তিনি পরে যান। বাড়ীর বারান্দায় রাস্তার পাশেই মনিরুজ্জামানের দোকান। অনুমান ৩০ মিঃ পরে তাহার দোকানে ফিরিয়া আসেন।

মনিরুজ্জামানকে আঘাত করিবার অনুমান ৫/১০ মিঃ পরে মনিরুজ্জামানের মাকে আঘাত করে। তাহারা ফেরানোর চেষ্টা করেন। মনিরুজ্জামানকে ব্যান্ডেজ করিয়া ৫/১০ মিঃ (অনুমান) পরবর্তীতে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। ইহা সত্য নহে যে, তাহার কথিত মতে কোন ঘটনা ঘটে নাই। ইহা সত্য নহে যে, তিনি বাদীর কথামত মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন।

রাস্ট্র পক্ষের ৯ নং সাক্ষী মোঃ আঃ কুদ্দুস, তার সাক্ষ্যে বলেন যে, গত ইং ৩০/০৫/২০০২ দুপুর ১:০০/১$\frac{1}{4}$ টার সময় ঘটনা। ডাক চিৎকার শুনিয়া ঘটনাস্থলে যান। তাহার বাসা উত্তর গোপালপুর, যাইয়া দেখেন মনিরের লাশ আনিয়াছে। বহু লোকজন উত্তেজিত হইয়া জিয়ার মা ও জিয়ার বাবাকে ধরিয়াছে। তাহারা বলেন যে মারপিট করিবার জন্য আসামীদের থানার পুলিশকে দেওয়া হয়। জিয়া, জিয়ার মা-বাবা এরা মনির ও মনিরের মাকে মারিয়াছে। তাই জনগন তাহাদের ধৃত করেন। জিয়া ও জিয়ার মা ডকে দাড়ানো আছে। জিয়ার বাবা পরে মারা গিয়াছে। দারোগা সাহেব জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন।

জেরাকালে তিনি বলেন যে, এ্যাম্বুলেন্স কে ডাকে জানেন না। জিয়ার পিতা বৃদ্ধ লোক ছিল। কে তাহাদের ধৃত করে জানেন না। কতক্ষণ আগে ধৃত করে জানেন না। ৩/৪ শত লোক তখন ছিল। কাজী শামসুল হক, বেলাল, আজিজ, ফুল মোহাম্মদ, সাহেব খাঁ ও অনেকে ছিল। তিনি যাইয়া এদের

দেখিয়াছেন। এ্যাম্বুলেন্স রাস্তার পাশে দাঁড়ানো ছিল। ঘটনার অনুমান ১ $\frac{1}{2}$ মাস পরে সাক্ষী দিয়াছেন। ইহা সত্য নহে যে তিনি কোন ঘটনা দেখেন নাই। ইহা সত্য নহে যে, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ১০ নং সাক্ষী তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, গত ৩০-৫-২০০২ অনুমান দুপুর ১ $\frac{1}{2}$ টার দিকে ঘটনা। মতিয়া রহমানের বাসার সামনে ঘটনা। তিনি বেলা ৩/৩$\frac{1}{4}$ টার সময় শুনেন যে, আসামী জিয়া তাহার মা ও বাবা এরা মনিরের মাকে মারিয়াছে। তিনি যাইয়া দেখেন যে, মনিরের লাশ আনিয়াছে। জনগণ জিয়ার বাবা ও মাকে ধরিয়া আনিয়াছে। জনগণ মারিবেন এই জন্য তাহারা তাহাদের থানায় সোপর্দ করেন। দারোগার কাছে জবানবন্দী দিয়াছেন।.

জেরায় তিনি বলেন যে, ইং ২৩/০৭/২০০২ তারিখে দারোগার কাছে জবানবন্দী দিয়াছেন খুব সম্ভব। এর মধ্যে পুলিশের সংগে দেখা হয় নাই। তিনি ঐদিন বাজারে ঘটনা শুনিয়াছেন, ঘটনাস্থল হইতে বাজার ১০০ গজ দূরে। তিনি শুনেন যে, হাসপাতাল হইতে লাশ আনিয়াছে। মৃতের বাবা ও মা লাশ আনিয়াছেন। লাশ হাসপাতালে নেয়া হয় কিনা জানেন না। কোথায় মারা যায় জানেন না। তিনি যখন আসেন তখন অনুমান ১০০ জনের মত লোক ছিল। তিনি অনুমান ২০/২৫ মিঃ ছিলেন। তিনি অনুমান ০৩-৩০ মিঃ সময় ঘটনাস্থলে আসেন। তিনি যাইয়া লাশ দেখেন। বেলাল, সাহেব খাঁ, কুদ্দুস ও সাধারণ লোকজন ছিল। এরাও তাহার সহিত থানাতে যায়। তিনি যখন যান তখন

পুলিশ আসেন নাই। বাজারে কাহার কাছে শুনিলেন জানেন না। ইহা সত্য নহে যে, ঘটনা যাহা বলিলেন তাহা মিথ্যা বলিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ১১ নং সাক্ষী বেলালকে ডেক্লাইন্ড ঘোষণা করা হয়। আসামী পক্ষেও তাহাকে জেরা করা হয় নাই।

রাষ্ট্রপক্ষের ১২ নং সাক্ষী মোঃ নাজমুল আহসান তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ১৯/০৯/২০০২ তাং গোপালপুর থানায় কর্মরত অবস্থায় অত্র এজাহার লিখেন এবং এফ,আই,আর ফরম পুরন করিয়া দস্তখত দেন, যাহা প্রদশর্নী-৫ এবং প্রদশর্নী ৫/ক হিসাবে সনাক্ত হয়। পূর্ববর্তী আই/ও মামলা তদন্ত করিয়া এস/ই দাখিল করিয়া বদলী হইয়া যান, তিনি ডকেট পান। সাক্ষীর স্মারক লিপির আদেশের অপেক্ষায় থাকেন। এস,আই, হুসেনুজ্জামান তদন্তের ফলাফল মোতাবেক সাক্ষী স্মারক আদেশ পাইয়া অত্র মামলার এজাহারভুক্ত আসামী মাখনের অব্যাহতির আবেদন করিয়া আসামী কহিনুর বেগম ও জিয়াউর রমহান (জিয়া) বিরুদ্ধে গোপালপুর থানার অভিযোগপত্র নং ৬৯ তাং ০৫/১০/২০০২ ধারা ৩২৩/৩০২ দাখিল করেন। আসামী আজাহার মারা যান।

জেরায় বলেন যে, তিনি সরে জমিনে তদন্ত করেন নাই। কাগজপত্র পর্যালোচনা করেন। তিনি সঠিকভাবে পর্যালোচনা করেন। আসামীদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমানিত না হওয়া সত্য নহে, মিথ্যা মনগড়া সি/এস দাখিল করিলেন সত্য নহে।

রাষ্ট্রপক্ষের ১৩ নং সাক্ষী মোঃ হোছাইনুজ্জামান তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি গত ইং ৩০-৫-২০০২ তারিখে টাংগইল জেলার গোপালপুর থানাতে কর্মরত থাকাকালে বাদীর লিখিত এজাহার মোতাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলা রজু করিয়া তাহাকে তদন্তভার দেন। তিনি ঘটনাস্থলে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। মৃত মনিরুজ্জামানের লাশের সুরতহাল করিয়া প্রতিবেদন তৈরি করেন। লাশ চালানযোগে কং ১১১৯ জুলহাস উদ্দিন মারফত মর্গে প্রেরণ করেন। ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ও সূচী অংকন করেন। আলামত জব্দ করেন। সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬১ ধারামতে জবানবন্দী রেকর্ড করেন। ২ জন আসামী (১) আজাহার আলী, (২) কোহিনুর বেগম জনতা কর্তৃক ধৃত ছিল তাহাদের গ্রেফতার করেন। সাক্ষ্য প্রমান সংগ্রহ করেন। তাহার বদলী হইলে কেস ডকেট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকটে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সুরতহাল প্রতিবেদন প্রদশর্নী ১/ঙ, জব্দ তালিকা ৩/ঘ, তাহার স্বাক্ষর ৩/খ লাশের চালান প্রদশর্নী ৬, তাহার স্বাক্ষর প্রদশর্নী ৬/ক, খসড়া মানচিত্র প্রদশর্নী ৭, তাহার স্বাক্ষর প্রদশর্নী ৭/ক। সুচিপত্র প্রদশর্নী-৮, তাহার স্বাক্ষর প্রদশর্নী ৮/ক হিসাবে সনাক্ত করেন।

জেরায় তিনি বলেন যে, তিনি ৩০/০৫/২০০২ ইং তারিখে ১৭-০৫ মিঃ সময়ে সিডি পান। ঐদিনই ঘটনাস্থলে যান। তিনি ১৮-৪৫ মিঃ সময়ে জব্দ তালিকা করেন। তিনি থানার মাঠের কোনায় লাশের সুরতহাল করেন। সময় ১৭-৩০ মিঃ পরে ভুলে লেখা আছে। কোন ইনিশিয়াল নাই। ঐখানেই

দেখিয়াছিলেন। ঘাড়ের নীচে রক্ত জমাট জখম ও কোমরে রক্ত জমাট জখম লেখা আছে। মাথায় কোন জখম দেখেন নাই। পুরুষাঙ্গে বীর্যপাত ছিল। সুরতহালের সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন। মতিয়ার, শাহজাহান, আজিজ, মোহাম্মদ আলী, হানিফ এরা সাক্ষী আছে। ঘাড়,পিঠ ও কোমরের আঘাতের কারনে নাক দিয়া রক্ত ও বীর্যপাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কে আঘাত করিয়াছে প্রাথমিক তদন্তে জানিতে পারেন নাই। ঘটনাস্থলের উত্তর পাশে বাদীর বসতঘর, দক্ষিনে পাকা রাস্তা, পূর্বে আলম হোসেনের রাইস মিল, পশ্চিমে আঃ হাই এর হাফ বিল্ডিং আছে। স্কেচম্যাপ ও ইনডেক্স সাক্ষীদের বাড়ী কত দূরে উল্লেখ করেন নাই। এস,পি মাহবুবুর রহমান ও এ,এস,পি মাহবুবুল আলম তাহার কেসের তদারকি করিয়াছেন। আসামী আজাহার ইং ১১/০৬/০২ তারিখে জেলখানায় মারা গিয়াছেন। জেল খানায় থাকাবস্থায় হাসপাতালে মারা যায়। তাহার নামে চার্জশীট হয় নাই। সাক্ষী বেলালকে উত্তর গোপালপুরে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন। সাক্ষী মনোয়ারা, শাহীনুর উত্তর গোপালপুরে সকাল ০৯-০০ টায় জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন। সাক্ষী সায়েদ খান ও আলী হোসেনকে উত্তর গোপালপুরে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন। সাক্ষী কুদ্দুসকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন। সাক্ষী আজিজ এর স্টেটমেন্ট উত্তর গোপালপুরে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া রেকর্ড করিয়াছেন। ঘাড়ের উপরে আঘাতের কথা বলিয়াছিলেন। সাক্ষী মনোয়ারা ও তাহার স্বামী ছাড়ানোর জন্য গিয়াছিল এই কথা বলে নাই, সাক্ষী শাহীনুর আসামী জিয়া ও কোহিনুর তাহাকে মারিতে যায়

এই কথা বলেন নাই। ইহা সত্য নহে যে, তিনি মামলা সঠিকভাবে তদন্ত করেন নাই। ইহা সত্য নহে যে, তদন্তকালে তিনি কোন সাক্ষী প্রমান পান নাই।

উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা ও তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ পূর্বক বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ আপীলকারীদের উপরোক্ত দন্ড প্রদান করিয়াছেন যাহা যথার্থ কিনা এবং আপীলকারী পক্ষ কোন প্রতিকার পাইতে পারে কিনা তাহা বিবেচ্য বিষয়।

আপীলটি শুনানীকালে আপীলকারী পক্ষ বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব ফজলুল হক খান ফরিদ নিবেদন করেন যে, মামলার কথিত খুনের বিষয়টি ক্ষণিকের উত্তেজনা বশতঃ সংঘটিত হইয়াছে এবং এই উত্তেজনাকর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন ভিকটিমের ভাই। ১নং আপীলকারীর খুনের কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না বিধায় তাহা ৩০২ ধারায় কোন অপরাধ হয় নাই বিধায় আপীলকারী খালাস পাওয়ার যোগ্য। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, ১নং আপীলকারী ০৫/০৩/২০০২ ইং তারিখ হইতে জেলে আছেন। আর অন্য দিকে ২নং আপীলকারীর বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য নাই; তাহার বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২ ধারায় অপরাধের কোন উপাদান বিদ্যমান নাই বিধায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে তাহার আপীল মঞ্জুর হওয়া ন্যায় সঙ্গত এবং তিনি খালাস পাওয়ার হকদার বটে।

অন্য দিকে প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন সরদার সঙ্গে সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল জনাব মোঃ

মামুনুর রশিদ নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ ১৩জন সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ করিয়া যথার্থই রায় প্রদান করিয়াছেন যাহাতে কোন ভুল ভ্রান্তি কিংবা কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় নাই বিধায় তর্কিত রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোন অবকাশ নাই বিধায় আপীলটি না-মঞ্জুর হইবে।

এজাহার, সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় ১ নং সাক্ষীর এজাহারের মূল বক্তব্য হইতেছে বাকীতে পান না দেওয়ার জন্য তাহার ছোট ছেলে শাহীনুরের সঙ্গে ১ নং আপীলকারীর বিবাদ বাধে। হৈচৈ শুনিয়া তিনি তাহার বড় ছেলে মনিরুজ্জামান, তাহার স্ত্রী মনোয়ারা বেগম ১ নং আপীলকারীকে বারণ করিতে থাকেন ঐ সময় ২ নং আপীলকারী মোছাঃ কোহিনুর বেগম, মোঃ আজাহার আলী হাজতে থাকাকালীন মৃত ও মাখন দলবদ্ধ হইয়া কাঠের ডুম (লাকড়ী) নিয়া চড়াও হয়। ১ নং আপীলকারী একটি কাঠের লাকড়ী দিয়া তাহার বড় ছেলে মনিরুজ্জামান এর পিছন দিক হইতে খুন করার অসৎ উদ্দেশ্যে মাথায় প্রচন্ড আঘাত করিলে ঐ আঘাতে মনিরুজ্জামান মাটিতে ঢলিয়ে পড়ে। ঐ সময়ে অন্যান্য বিবাদীরা মনিরুজ্জামানের প্রায় অচেতন দেহের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের পর আঘাত করিয়া গুরুতর জখম করে। বিবাদী কোহিনুর বেগম হাতের কাঠের (ডুম) লাকড়ী দিয়া তাহার স্ত্রীকে খুন করার অসৎ উদ্দেশ্যে মাথা লক্ষ্য করিয়া বাড়ী মারিলে তাহার স্ত্রী মাথা সরাইয়া

নেওয়ায় ঐ আঘাত তাহার নাকে লাগিয়া নাকের বাম অংশ কাটিয়া গুরুতর জখম হয়।

এজাহার অনুযায়ী এই মামলার চাক্ষুস সাক্ষী এজাহারকারী নিজে ১নং সাক্ষী তাহার স্ত্রী মোছাঃ মনোয়ারা বেগম ৬নং সাক্ষী এবং তাহার ছোট ছেলে শাহীনুর ৭নং সাক্ষী, ২নং সাক্ষী আবদুল আজিজ, তাহারা সকলেই এজাহারের ঘটনা সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং ঘটনা সম্পর্কে পরস্পরকে সমর্থন করিয়াছেন।

সাক্ষীদের সাক্ষ্যের সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১ নং আপীলকারী ৭ নং সাক্ষীর নিকট ২ টাকার পান বাকিতে চাহিলে ৭ নং সাক্ষী বাকী দিতে অস্বীকার করিলে উভয়ের মধ্যে ঝগড়াঝাটি শুরু হয় এবং উভয় পক্ষের লোকজন তথা ৭ নং সাক্ষীর পিতা ১ নং সাক্ষী, মাতা ৬ নং সাক্ষী এবং ভাই মনিরুজ্জামান (ভিকটিম)অন্য দিকে ১ নং আপীলকারী, মাতা ২নং আপীলকারী, পিতা ৩ নং আসামী (পরবর্তীতে মৃত), ৪ নং আসামী মাখন (অব্যাহতি প্রাপ্ত) ঘটনা স্থলে আসেন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে স্বভাবতই বিষয়টি নিয়া হৈহুল্লা হয়। এমতাবস্থায় ১ নং আপীলকারীর লাকড়ীর আঘাতে মনিরুজ্জামান মাটিতে লুটিয়া পড়ে এবং পরে হাসপাতালে নেওয়ার সময় মারা যায়। চাক্ষুস সাক্ষীদের সাক্ষ্যে এই ঘটনার সত্যতা প্রমানিত।

ঘটনার উৎপত্তি বাকীতে পান না দেওয়ার জন্য ১ নং আপীলকারীর সঙ্গে ৭ নং সাক্ষীর এবং ৭ নং সাক্ষীর আচরণে ১ নং আপীলকারী উত্তেজিত

হইয়াছিল সেক্ষেত্রে তাহার আক্রোশ ৭ নং সাক্ষীর উপরই থাকা স্বাভাবিক এবং প্রথম আঘাত তাহাকেই করার কথা কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায় ৭ নং সাক্ষীর ভাই মৃত মনিরুজ্জামান ১ নং আপীলকারীর আঘাতের কারণে নিহত হইয়াছেন যাহা পরিকল্পিত খুন হিসাবে গণ্য না হইয়া নর হত্যা বলিয়া গণ্য হইবে। এক্ষেত্রে রামেস-বনাম-রাষ্ট্র ১৯৯৫ ফৌঃ লঃ জর্নাল ২৯০৭(এসসি) মামলার সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে;

> " Ramesh Vithalrao Thakre and another Vs. State of maharashtra, 1995 Crl. L.J. 2907 (SC)" The primary target of the accused was the brother of the deceased. But the deceased came to rescue her brother and received injury on his chest. After that the accused neithter attacked his target nor inflected any more injury to the deceased. Held that even though the principle contained in section 301 IPC would be applicable to the case, it appears to us that the accused can only be clothed with the knowledge that the innury which he was causing was likely to cause the death. The offence, under the Circumstance, would be one which would fall under section 304 Part.II.IPC(Para-7)

১ নং আপীলকারী তাহার মাথার পিছনে ঘাড়ে আঘাত করিয়াছেন বলিয়া চাক্ষুস সাক্ষীদের সাক্ষ্যমতে প্রতিষ্ঠিত। কথিত ঘটনার ফলে ভিকটিম

মনিরুজ্জামান নিহত হইয়াছে ইহা অবস্থাদৃষ্টে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্যদ্বারা প্রমানিত কিন্তু ইহা খুন না অপরাধজনক নরহত্যা তাহাই মূখ্য বিচার্য্য বিষয়। সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রমানে স্বীকৃত যে ৭ নং সাক্ষী ও ১নং আপীলকারীর মধ্যে বাকীতে পান না দেওয়ার বিষয় নিয়া ঘটনার সৃষ্টি, যাহা তাৎক্ষনিক ভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে মারামারির রূপ নেয় এবং এরই এক পর্যায়ে ১নং আপীলকারী মৃত মনিরুজ্জামানকে তাৎক্ষনিকভাবে ক্ষণিকের উত্তেজনায় ঘটনা স্থলের পাশে স্তুপ করা কাঠের লাকড়ি হইতে অনুমান ১৮" লম্বা ৮" বেড় একটি কাঠের ডুম (লাকড়ি) দ্বারা আঘাত করে যাহা ছোরা বা আগ্নেয়াস্ত্রের মত মারাত্নক অস্ত্র নহে; সুতরাং ইহা দ্বারা খুনের উদ্দেশ্য ছিল বলা যায় না। এধরনের ভোঁতা লাকড়ির আঘাতে মৃত্যু হওয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় না যে উহা খুন ছিল বরং অপরাধজনক নরহত্যা ছিল, যাহা দন্ডবিধির ৩০৪ ধারার আওতায় দন্ডনীয়। এক্ষেত্রে ৭ বিসিআর (এডি) ২১৪, খান আঃ হাফিজ এবং অন্য একজন-বনাম-রাষ্ট্র মামলার নজির এখানে প্রণিধানযোগ্য যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> " .....
> In view of the nature of the act of causing death [A plank (তক্তা) of 2 cubits in length, 5 inches in breadth and 1 inch in thickness is not as deadly as a dagger or fire-arm from which intention to kill can be inferred], the view is that this act does not constitute 'murder' but constitutes 'culpable

homicide not amounting to murder' punishable u/s 304, part-1 of the Penal Code."

সাক্ষীদের সাক্ষ্যমতে ১নং আপীলকারী মৃত মনিরুজ্জামানকে যে কাঠের লাকড়ী (ডুম) দিয়া আঘাত করে তাহা ঘটনা স্থলের তথা ১নং সাক্ষী এজাহারকারীর দোকানের সন্নিকটে নুরী বেকারীর সামনে লাকড়ীর স্তুপ হইতে নেওয়া। যাহা সুস্পষ্টভাবে প্রমান করে ঘটনার আকর্ষিকতায় ১ নং আপীলকারী হাতের কাছে যাহা পায় তাহা দিয়া ভিকটিমকে আঘাত করে, এখানে খুন করার পূর্ব পরিকল্পনার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। অর্থাৎ পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া হত্যা হইলে তাহা খুন নহে ইহা অপরাধজনক নরহত্যা হইবে। এই ক্ষেত্রে বন্দেজ আলী ওরফে মোঃবন্দেজ আলী-বনাম-রাষ্ট্র, ৪০ডিএলআর (এডি) ২০০ মামলায় গৃহীত আপীল বিভাগের সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

"In the case of murder, the offender has a positive intention to cause the death of the victim. He assaults him with the intention of causing death or with definite knowledge that the bodily injury inflicted by him would cause death or the injury would be sufficient in the ordinary course of nature to cause death, or the injury was so imminently dangerous that it must cause death. In the case of culpable homicide the intention or knowledge is not so positive or definite. The injury caused may or may not cause the death of the victim. To find that the offender is guilty or

murder, it must be held that his case falls within any of the four clauses of section 300, otherwise he will be guilty of culpable homicide not amounting to murder. Facts of the case show that death was caused without premeditation".

সার্বিক পর্যালোচনা ও উল্লেখিত নজিরগুলির সিদ্ধান্তের আলোকে ইহা বিবেচনায় নেওয়া আইনসঙ্গত যে, অত্র মামলাটি দন্ডবিধির ৩০০ ধারায় খুনের আওতায় না পড়িয়া দন্ডবিধির ৩০৪ ধারায় অপরাধ জনক নরহত্যার আওতায় পড়ে বলিয়া দন্ডিত আপীলকারীদ্বয়কে দন্ডবিধির ৩০৪/৩৪ ধারায় অভিযুক্ত করা যথাযথ ও যুক্তি নির্ভর বলিয়া আমাদের অভিমত।

অতএব,

ফলাফল,

উপরোক্ত অভিমতের আলোকে আপীলটি আংশিক মঞ্জুর করা হইল। আপীলকারীদের দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারার পরিবর্তে ৩০৪/৩৪ ধারার দ্বিতীয় অংশে দোষী সাব্যস্তক্রমে তাহাদের দন্ড সংশোধন পূর্বক তাহারা যে পর্যন্ত সাজা ভোগ করিয়াছেন তাহাই সাজা হিসাবে গণ্য করিয়া তাহাদের সাজা ভোগ শেষ হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইল, উল্লেখ্য যে আপীলকারীদ্বয় ৩০/০৫/২০০২ ইং তারিখ হইতে জেল হাজতে আছেন। পরবর্তী ২নং আপীলকারী মহামান্য হাইর্কোট হইতে ২২/১০/২০০৯ ইং তারিখে জামিনে

মুক্তি পাইয়াছেন সেহেতু তাহার জামিনের মুচলেকা প্রত্যাহার করা হইল। ১ নং আপীলকারীর বিরুদ্ধে অন্য কোন মামলায় আটকাদেশ না থাকিলে তাহাকে মুক্তির নির্দেশ দেওয়া হইল।

রায়ের কপি সহ নিম্ন আদালতের নথি ফেরৎ প্রেরণ করা হউক।

বিচারপতি এম, ইনায়েতুর রহিমঃ

আমি একমত।

সিদ্দিক/বি,ও